আন নাযি'আত

৭৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالنّٰزِعٰتِ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আম্মা ইয়াতাসা–আলূনা"র পরে এ সূরাটি নাযিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ এবং এ সংগে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ।

বক্তব্যের সূচনায় মৃত্যুকালে প্রাণ হরণকারী, আল্লাহর বিধানসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং মৃত্যুর পরে নিশ্চিতভাবে আর একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে। কারণ যে ফেরেশতাদের সাহায্যে আজ মানুষের প্রাণবায়ু নির্গত করা হচ্ছে তাদেরই সাহায্যে আবার মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে। যে ফেরেশতারা আজ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সংগে সংগেই আল্লাহর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, আগামীকাল সেই ফেরেশতারাই সেই একই আল্লাহর হুকুমে এ বিশ্ব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিতে এবং আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এরপর লোকদের জানানো হয়েছে, এই যে কাজটিকে তোমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করো, আল্লাহর জন্য এটি আদতে এমন কোন কঠিন কাজই নয়, যার জন্য বিরাট ধরনের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। একবার ঝাঁকুনি দিলেই দুনিয়ার এ সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিলে তোমরা অকস্মাৎ নিজেদেরকে আর একটি নতুন জগতের বুকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন যারা এ পরবর্তী জগতের কথা অস্বীকার করতো তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। যেসব বিষয় তারা অসম্ভব মনে করতো তখন সেগুলো দেখতে থাকবে অবাক বিস্ময়ে।

তারপর সংক্ষেপে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কথা বর্ণনা করে লোকদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার, তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পরাজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিণাম ফেরাউন দেখে নিয়েছে। ফেরাউনের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করো তাহলে তোমাদের পরিণামও অন্য রকম হবে না।

এরপর ২৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবনের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন কাজ অথবা প্রথমবার মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ–নক্ষত্র সহ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্ব–জগত সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর জন্য এ কাজটি কঠিন ছিল না তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে এ অকাট্য যুক্তি পেশ করার পর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণের জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের এ উপকরণের প্রতিটি বস্তুই এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা সহকারে তাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইংগিত করার পর মানুষের নিজের চিন্তা–ভাবনা করে মতামত গঠনের জন্য এ প্রশ্নটি তার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব–জাহানের এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় মানুষের মতো একটি বুদ্ধিমান জীবকে স্বাধীন ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও দায়িত্ব অর্পণ করে তার কাজের হিসেব নেয়া, অথবা সে পৃথিবীর বুকে সব রকমের কাজ করার পর মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তারপর তাকে যে ক্ষমতা–ইখতিয়ারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং যে দায়িত্বসমূহ তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে পালন করেছে, তার হিসেব কখনো নেয়া হবে না— এর মধ্যে কোনটি বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? এ প্রশ্নে এখানে কোন আলোচনা করার পরিবর্তে ৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের দিন মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ভবিষ্যতের ফায়সালা করা হবে। দুনিয়ায় নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে কে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে, পার্থিব লাভ, স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদনকে উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে এবং কে নিজের রবের সামনে হিসেব–নিকেশের জন্য দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীতি অনুভব করেছে ও নফসের অবৈধ আকাংখা–বাসনা পূর্ণ করতে অস্বীকার করেছে, সেদিন এরি ভিত্তিতে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। একথার মধ্যেই ওপরের প্রশ্নের সঠিক জবাব রয়ে গেছে। জিদ ও হঠকারিতামুক্ত হয়ে ঈমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোন ব্যক্তিই এ জবাব হাসিল করতে পারে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যেসব ইখতিয়ার ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ শেষে তার কাজের হিসেব নেয়া এবং তাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়াই হচ্ছে এ ইখতিয়ার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী।

সবশেষে মক্কার কাফেরদের যে একটি প্রশ্ন ছিল 'কিয়ামত কবে আসবে,–তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বারবার

করতো। জবাবে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কেয়ামত যে অবশ্যই হবে এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে পারে আবার যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে ভীত না হয়ে লাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর যখন সে সময়টি এসে যাবে তখন এ দুনিয়ার জীবনের জন্য যারা প্রাণ দিতো এবং একেই সবকিছু মনে করতো, তারা অনুভব করতে থাকবে, এ দুনিয়ার বুকে তারা মাত্র সামান্য সময় অবস্থান করেছিল। তখন তারা জানতে পারবে, এ মাত্র কয়েক দিনের জীবনের বিনিময়ে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

সেই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে এবং খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর (সেই ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে, বারবার (হুকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়, এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে।[১] যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা ঝাঁকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা।[২] কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।[৩] দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহবল।

১. এখানে যে বিষয়টির জন্য পাঁচটি গুণাবলীসম্পন্ন সত্তাসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে তার কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের নিশ্চতভাবেই আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন্ কোন্ সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুদ্ দূহা ও সুদ্দী বলেন ঃ ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। দ্রুতগতিতে সাঁতরে চলার সাথে হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবু সালেহ ফেরেশতাদেরকেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম তামিল করার জন্য এমন দ্রুত গতিশীল রয়েছে যেন মনে হচ্ছে তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে। "সবেগে এগিয়ে যাওয়ার" ব্যাপারেও এই একই অর্থ গ্রহণ করেছেন হযরত আলী (রা) মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, মাসরূক ও

يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩ ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ⑭

এরা বলে, "সত্যিই কি আমাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? পচা–গলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও?" বলতে থাকে "তাহলে তো এ ফিরে আসা হবে বড়ই লোকসানের!"[৪] অথচ এটা শুধুমাত্র একটা বড় রকমের ধমক এবং হঠাৎ তারা হাযির হবে একটি খোলা ময়দানে।[৫]

হাসান বসরী প্রমুখগণ। আর সবেগে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের প্রত্যেকেই তা তামিল করার জন্যে দৌড়ে যায়। "সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনাকারী বলতেও ফেরেশতাদের কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, হাসান বসরী, কাতাদাহ থেকে একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এরা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার এমন সব কর্মচারী যাদের হাতে আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কোন সহীহ হাদীসে এ আয়াতগুলোর এ অর্থ বর্ণিত না হলেও প্রথম সারির কয়েকজন সাহাবা এবং তাঁদেরই ছাত্রমণ্ডলীর অন্তরভুক্ত কতিপয় তাবেঈ যখন এগুলোর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন তখন তাঁদের এই জ্ঞান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অর্জিত হয়ে থাকবে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ফেরেশতাদের কসম খাওয়ার কারণ কি? তারা নিজেরাই তো সে জিনিসের মতো অদৃশ্য ও অননুভূত, যা অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? এর কারণ অবশ্য আল্লাহ ভালো জানেন। তবে আমার মতে এর কারণ হচ্ছে, আরববাসীরা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা স্বীকার করতো মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই মানুষের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়। তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা অতি দ্রুতগতিশীল হয়, এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় এবং হুকুম করার সাথে সাথেই যে কোন কাজ মুহূর্তকাল দেরী না করেই করে ফেলে। তারা একথাও মানতো, ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং আল্লাহর হুকুমেই বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। ফেরেশতারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র 'ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণার অধিকারী নয়। মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তারা অবশ্যি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। তারা তাদেরকে নিজেদের মাবুদে পরিণত করেছিল। কিন্তু আসল ক্ষমতা–ইখতিয়ার যে ফেরেশতাদের হাতে একথা তারা মনে করতো না। তাই এখানে কিয়ামত হওয়া এবং মৃত্যুর পরের জীবন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ফেরেশতাদের উপরোল্লিখিত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ
وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ
الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

তোমার[৬] কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে? যখন তার রব তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায়[৭] ডেকে বলেছিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তাকে বলো, তোমার কি পবিত্রতা অবলম্বন করার আগ্রহ আছে এবং তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে?"[৮] তারপর মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় নিদর্শন[৯] দেখালো। কিন্তু সে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করলো ও অমান্য করলো, তারপর চালবাজী করার মতলবে পিছন ফিরলো।[১০] এবং লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো : "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব"[১১] অবশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। আসলে এর মধ্যে রয়েছে মস্তবড় শিক্ষা, যে ভয় করে তার জন্যে।[১২]

যে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়, তাঁরই হুকুমে তারা আবার তোমাদের প্রাণ দানও করতে পারে। যে আল্লাহর হুকুমে তারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে তাঁরই হুকুমে, যখনই তিনি এ হুকুম করবেন তখনই তারা এ বিশ্ব–জাহানকে ধ্বংস করে দিতে এবং আর একটি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতেও পারে। তাঁর হুকুম তামিল করার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম শৈথিল্য বা মুহূর্তকাল দেরীও হতে পারে না।

২. প্রথম ধাক্কা বলতে এমন ধাক্কা বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় ধাক্কা বলতে যে ধাক্কায় সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা যুমারে এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে : "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও

আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" (৬৮ আয়াত)

৩. "কতক হৃদয়" বলা হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীত ও আতংকিত হবে। সৎ মু'মিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। সূরা আম্বিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।" (১০৩ আয়াত)

৪. অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হল, হাঁ সেখানে এমনটিই হবে, তারা বিদ্রূপ করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো ঃ সত্যিই যদি আমাদের আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে তো আমরা মারা পড়বো। এরপর আমাদের আর রক্ষে নেই।

৫. অর্থাৎ তারা এটাকে একটা অসম্ভব কাজ মনে করে একে বিদ্রূপ করছে। অথচ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধমক বা ঝাঁকুনিই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের শরীরের ধ্বংসাবশেষ মাটি বা ছাই যে কোন আকারেই থাক না কেন সব দিক থেকে উঠে এসে এক জায়গায় জমা হবে এবং অকস্মাৎ তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে জীবিত আকারে দেখতে পাবে। এ ফিরে আসাকে যতই ক্ষতিকর মনে করে তোমরা তা থেকে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করো না কেন, এ ঘটনা অব্যশই ঘটবে। তোমাদের অস্বীকার, পলায়ন প্রচেষ্টা বা ঠাট্টা–বিদ্রূপে এটা থেমে যাবে না।

৬. মক্কার কাফেরদের কিয়ামত ও আখেরাতকে না মানা এবং তা নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা আসলে কোন দার্শনিক তত্ত্বের অস্বীকৃতি ছিল না। বরং এভাবে তারা আল্লাহর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যে কৌশল অবলম্বন করতো তা কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রসূলকে আঘাত হানা ও ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই আখেরাতের জীবনের ব্যাপারে আরো বেশী যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার আগে তাদেরকে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের ঘটনা শুনানো হচ্ছে। এভাবে তারা রসূলের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এবং রসূল প্রেরণকারী আল্লাহর মোকাবিলায় মাথা উঁচু করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারবে।

৭. পবিত্র তুওয়া উপত্যকার অর্থ বর্ণনা করে সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন ঃ "সেই পবিত্র উপত্যকাটি যার নাম ছিল তুওয়া" কিন্তু এ ছাড়া এর আরো দু'টি অর্থও হয়। এক, "যে উপত্যকাটিকে দু'বার পবিত্র করা হয়েছে।" কারণ মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ)–কে সেখানে সম্বোধন করে প্রথম বার তাকে পবিত্র করেন। আর হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে এনে এ উপত্যকায় অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে দ্বিতীয়বার পবিত্রতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। দুই, "রাতে পবিত্র উপত্যকায় সম্বোধন

করেন।" আরবী প্রবাদে বলা হয় ঃ جاء بعد طوى অর্থাৎ উমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর এসেছিল।

৮. এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ হযরত মূসাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার সময় তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল কুরআন মজীদের যথার্থ স্থানে তা কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলার সুযোগ ছিল। তাই এখানে কেবল সেগুলোর সারাংশই বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বা-হার ৯ থেকে ৪৮, শু'আরার ১০ থেকে ১৭, নামলের ৭ থেকে ১২ এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুই ঃ এখানে ফেরাউনের যে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মোকাবিলায় বিদ্রোহ করা। স্রষ্টার মোকাবিলায় বিদ্রোহ করার বিষয়টির আলোচনা সামনের দিকে এসে যাচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন তার প্রজাদের সমবেত করে ঘোষণা করে, "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।" আর সৃষ্টির মোকাবিলায় তার বিদ্রোহ ও সীমালংঘন ছিল এই যে, সে নিজের শাসনাধীন এলাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। দুর্বল শ্রেণীগুলোর ওপর সে চালাতো কঠোর জুলুম-নির্যাতন এবং নিজের সমগ্র জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিল। একথা সূরা কাসাসের ১৪ আয়াতে এবং সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন ঃ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ "তুমি ও তোমার ভাই হারুন, তোমরা দু'জনে তার সাথে মোলায়েম সুরে কথা বলবে, হয়তো সে নসীহত গ্রহণ করতে ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।" (সূরা ত্বা-হা ৪৪ আয়াত) এ মোলায়েম সুরে কথা বলার একটা নমুনা এ আয়াতগুলোতে পেশ করা হয়েছে। এ থেকে একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পথ দেখাবার জন্য তার কাছে কিভাবে বিচক্ষণতার সাথে সত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে তার কলাকৌশল জানা যায়। এর দ্বিতীয় নমুনাটি পেশ করা হয়েছে সূরা ত্বা-হা'র ৪৯ থেকে ৫২, আশ্ শু'আরার ২৩ থেকে ২৮ এবং আল কাসাসের ৩৭ আয়াতে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ যেসব আয়াতে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কৌশল শিখিয়েছেন এ আয়াতগুলো তারই অন্তরভুক্ত।

চার ঃ হযরত মূসাকে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করার জন্য ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়নি, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তাঁকে নবুওয়াত দান করে ফেরাউনের কাছে পাঠাবার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল ফেরাউন ও তার কওমকে সত্য সঠিক পথ দেখানো। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, যদি সে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ না করে তাহলে তিনি বনী ইসরাঈলকে (যারা আসলে ছিল একটি মুসলিম কওম) তার দাসত্বমুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনবেন। 'এ আয়াতগুলো থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ এগুলোতে বনী ইসরাঈলের রেহাইয়ের কোন উল্লেখই নেই। বরং হযরত মূসাকে

ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্যের দাওয়াত প্রচার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেসব আয়াতে হযরত মূসা ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন এবং বনী ইসরাঈলদের রেহাই–এর দাবীও করেছেন সেসব আয়াত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল 'আরাফের ১০৪ থেকে ১০৫, ত্বা–হা'র ৪৭´ থেকে ৫২, আশ শূ'আরার ১৬ থেকে ১৭ এবং ২৩ থেকে ২৮ আয়াত। (আরও বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুসের ৭৪ টীকা দেখুন)

পাঁচ ঃ এখানে পবিত্রতা (আত্মিক শুদ্ধতা) অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আকীদা–বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্ম সবক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বন করা। অন্য কথায় ইসলাম গ্রহণ করা। ইবনে যায়েদ বলেন, কুরআনে যেখানেই ['তাযাক্কী' (আত্মিক) শুদ্ধতা] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয় ইসলাম গ্রহণ করা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি পেশ করেন ঃ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ "আর এটি হচ্ছে তাদের প্রতিদান যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ "আর তোমরা জান, হয়তো তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে।" অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যেতে পারে। وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ "আর কী যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে না পারে তাহলে তোমার কি দায়িত্ব আছে?" অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান না হয়। (ইবনে জারীর)।

ছয় ঃ আর "তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে" –একথার অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি নিজের রবকে চিনে নেবে এবং তুমি জানতে পারবে যে, তুমি তার বান্দাহ, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নও তখন অনিবার্যভাবে তোমার দিলে তাঁর ভয় সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর ভয় এমন একটি জিনিস যার ওপর দুনিয়ার মানুষের সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ নির্ভর করে। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর ভয় ছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুদ্ধ আত্মার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

৯. বড় নিদর্শন বলতে এখানে লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যি একটি নিষ্প্রাণ লাঠির মানুষের চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হওয়া, যাদুকরেরা এর মোকাবিলায় লাঠি ও দড়ি দিয়ে যেসব কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল সেগুলোকে টপাটপ গিলে ফেলা এবং হযরত মূসা (আ) যখন একে ধরে উঠিয়ে নিলেন তখন আবার এর লাঠি হয়ে যাওয়া, এর চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? এসব একথারই সুস্পষ্ট আলামত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

১০. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন সারা মিসর থেকে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী যাদুকরদের ডেকে আনে এবং একটি বিশাল সাধারণ সমাবেশে তাদেরকে লাঠি ও দড়ি দিয়ে অজগর সাপ বানাতে বলে, যাতে করে লোক বিশ্বাস করে যে মূসা আলাইহিস সালাম কোন নবী নন বরং একজন যাদুকর এবং লাঠিকে অজগরে পরিণত করার যে তেলেসমাতি তিনি দেখিয়েছেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ প্রতারণাপূর্ণ কৌশল ব্যর্থ হলো এবং যাদুকররা পরাজিত

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۗءُ ۭ بَنٰىهَا ۝٢٧ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝٢٨
وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝٢٩ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝٣٠
اَخْرَجَ مِنْهَا مَاۗءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝٣١ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝٣٢ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٣

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আকাশের?[১৪] আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ছাদ অনেক উঁচু করেছেন। তারপর তার ভারসাম্য কায়েম করেছেন। তার রাতকে ঢেকে দিয়েছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।[১৫] এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।[১৬] তার মধ্য থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন[১৭] এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, জীবন যাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য।[১৮]

হয়ে নিজেরাই স্বীকার করে নিল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা।

১১. ফেরাউনের এ দাবীটি কুরআনের কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার সে হযরত মূসা (আ)–কে বলে, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো।" (আশ শূ'আরার ২৯ আয়াত) আর একবার সে তার দরবারের লোকদের সম্বোধন করে বলে, "হে জাতির প্রধানরা আমি জানি না আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদাও আছে।" (আল কাসাস ৩৮ আয়াত) ফেরাউনের এসব বক্তব্যের এ অর্থ ছিল না এবং এ অর্থ হতেও পারে না যে, সে–ই এই বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং এ পৃথিবীটাও সে সৃষ্টি করেছে। এ সবের এ অর্থও ছিল না যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং নিজেকেই বিশ্ব–জাহানের রব বলে দাবী করে। আবার এ অর্থও ছিল না যে, সে ধর্মীয় অর্থে একমাত্র নিজেকেই লোকদের মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করে। তার ধর্মের ব্যাপারে কুরআন মজীদই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে নিজেই অন্য উপাস্যদের পূজা করতো। তাই দেখা যায় তার সভাসদরা একবার তাকে সম্বোধন করে বলে, "আপনি কি মূসাকে ও তার কওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করার স্বাধীনতা দিতে থাকবেন? (আল আ'রাফ ১২৭ আয়াত) কুরআনে ফেরাউনের এ বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মূসা যদি আল্লাহর প্রেরিত হতো তাহলে তার কাছে সোনার কাঁকন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতাদেরকে চাপরাশি–আরদালি হিসেবে পাঠানো হয়নি কেন? (আয্ যুখরুফ ৫৩ আয়াত) কাজেই এ থেকে বুঝা যায় যে, আসলে সে ধর্মীয় অর্থে নয়

বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ, উপাস্য ও প্রধান রব হিসেবে পেশ করতো। অর্থাৎ এর অর্থ ছিল, আমি হচ্ছি প্রধান কর্তৃত্বের মালিক। আমি ছাড়া আর কেউ আমার রাজ্যে হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। আর আমার ওপর আর কোন উচ্চতর ক্ষমাতাধরও নেই, যার ফরমান এখানে জারী হতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ ৮৫ টীকা, ত্বা-হা ২১ টীকা, আশ্ শূ'আরা ২৪ ও ২৬ টীকা, আল কাসাস ৫২ ও ৫৩ টীকা এবং আয যুখরুফ ৪৯ টীকা)

১২. অর্থাৎ আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার ও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণামকে ভয় করো। ফেরাউন এই পরিণামের মুখোমুখি হয়েছিল।

১৩. কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৪. এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। আর আকাশ মানে সমগ্র উর্ধজগত, যেখানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, অগণিত সৌরজগত, নীহারিকা ও ছায়াপথ। একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাকে বড়ই অসম্ভব কাজ মনে করছো। বারবার বলছো, আমাদের হাড়গুলো পর্যন্ত যখন পচে গলে যাবে, সে অবস্থায় আমাদের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো আবার এক জায়গায় জমা করা হবে এবং তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, এই বিশাল বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি বেশী কঠিন কাজ, না তোমাদের একবার সৃষ্টি করার পর দ্বিতীয়বার সেই একই আকৃতিতে সৃষ্টি করা কঠিন? যে আল্লাহর জন্য প্রথমটি কঠিন ছিল না তার জন্য দ্বিতীয়টি অসম্ভব হবে কেন? মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে ঃ "আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" (৮১ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৫৭ আয়াত)

১৫. রাত ও দিনকে আকাশের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ আকাশের সূর্য অস্ত যাওয়ার ফলে রাত হয় এবং সূর্য উঠার ফলে হয় দিন। রাতের জন্য ঢেকে দেয়া শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যেন ওপর থেকে তার ওপর পরদা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৬. "এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন"-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এটা ঠিক এমনই একটা বর্ণনা পদ্ধতি যেমন আমরা বলে থাকি, "তারপর একথাটা চিন্তা করতে হবে।" এর মানে এ নয় যে, প্রথমে ওই কথাটা বলা হয়েছে তারপর একথাটা বলা হচ্ছে। এভাবে আগের কথার সাথে একথাটার ঘটনামূলক ধারাবাহিক সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং দু'টো কথা একসাথে বলা হলেও এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় একটা কথার পরে দ্বিতীয় কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই বর্ণনা পদ্ধতির অসংখ্য নজীর কুরআন মজীদেই পাওয়া

যাবে। যেমন সূরা কলমে বলা হয়েছে ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ "জালেম এবং তারপর বজ্জাত" এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে সে জালেম হয়েছে তারপর হয়েছে বজ্জাত। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে জালেম এবং তার ওপর অতিরিক্ত হচ্ছে সে বজ্জাতও। এভাবে সূরা বালাদে বলা হয়েছে ঃ فَكُّ رَقَبَةٍ .... ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا "দাসকে মুক্ত করে দেয়া ....তারপর মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হওয়া।" এর অর্থও এ নয় যে, প্রথমে সে (দাস মুক্ত করে) সৎকাজ করবে তারপর ঈমান আনবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এসব সৎকাজ করার প্রবণতার সাথে সাথে তার মধ্যে মু'মিন হবার গুণটিও থাকতে হবে। এখানে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২৯ আয়াতে। আবার কোথাও আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এই আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কুরআনের এসব জায়গায় কোথাও কাকে আগে ও কাকে পরে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা বলা মূল বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং যেখানে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানে আকাশসমূহের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে এবং পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে পরে। আবার যেখানে ভাষণের ধারা অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ যেসব নিয়ামত লাভ করছে সেগুলোর কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেখানে পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে আকাশের আগে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, হা–মীম আস্ সাজদাহ ১৩ থেকে ১৪ টীকা দেখুন)

১৭. উদ্ভিদ বলতে শুধু প্রাণীদের খাদ্য উদ্ভিদের কথা বলা হয়নি বরং মানুষ ও পশু উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যাবতীয় উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে। রা'আ (رَعَى) ও রত্'আ (رتع) শব্দ দু'টি যদিও সাধারণভাবে আরবী ভাষায় পশুদের চারণভূমির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবুও কখনো কখনো মানুষের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা তাদের মহামান্য পিতাকে বলেন ঃ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ "আপনি আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। কিছু চরে বেড়াবে এবং খেলাধূলাও করবে" (১৩ আয়াত) এখানে শিশু কিশোরের জন্য চরে বেড়ানো শব্দটি বনের মধ্যে চলাফেরা ও ঘোরাঘুরি করে গাছ থেকে ফল পাড়া ও খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮. এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য দুই ধরনের যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ অসাধারণ বিস্ময়কর ভারসাম্য সহকারে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বজগত এবং জীবন যাপনের নানাবিধ উপকরণ সহকারে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের অনুষ্ঠান মোটেই কঠিন ও অসম্ভব ব্যাপার নয়। দুই, এই মহাবিশ্বে ও এ পৃথিবীতে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞানবত্তার যেসব নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে কোন কাজই উদ্দেশ্যহীনভাবে হচ্ছে না। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, নীহারিকা ও ছায়াপথের মধ্যে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা একথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এসব কিছু অকস্মাৎ হয়ে যায়নি। বরং এর পেছনে একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছে। একটি

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

তারপর যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে।[১৯] যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব স্মরণ করবে[২০] এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত।[২১]

নিয়মের অধীনে এই রাত ও দিনের আসা যাওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে এই নিয়ম-শৃংখলা কায়েম করা হয়েছে। এ পৃথিবীতেই এমন এলাকা আছে যেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিন রাত্রির আবর্তন হয়। আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে রাত হয় অতি দীর্ঘ এবং দিনও হয় অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর জনবসতির অনেক বড় অংশ প্রথম এলাকায় অবস্থিত। আবার যেখানে রাত ও দিন যত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে থাকে সেখানে জীবন যাপনও হয় তত বেশী কঠিন ও কষ্টকর। ফলে জনবসতিও সেখানে তত বেশী কম হয়ে যেতে থাকে। এমন কি যে এলাকায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় সে এলাকা জনবসতির মোটেই উপযোগী নয়। এ পৃথিবীতেই এ দু'টি নমুনা দেখিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ এ সত্যটি প্রমাণ করেছেন যে, রাত ও দিনের যথা নিয়মে যাওয়া আসার ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রমিক ব্যাপার নয় বরং পৃথিবীকে মানুষের উপযোগী করার জন্য বিপুল জ্ঞান ও কলা কুশলতা সহকারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীকে তিনি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন যার ফলে তা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তার মধ্যে এমন পানি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ও পশু পান করতে এবং যার সাহায্যে উদ্ভিদ জীবনী শক্তি লাভ করতে পারে তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন এবং এমন সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা মানুষ ও সব ধরনের প্রাণীর জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। এসব কিছুই একথা প্রমাণ করে যে, এগুলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয় বা কোন বাজিকর ডুগডুগি বাজিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এসব করে বসেনি। বরং এর প্রত্যেকটি কাজই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পন্ন করেছেন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্তা। এখন কিয়ামত ও পরকালের জীবন অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া কোন্‌টা যুক্তিসংগত ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্মত, সুস্থবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই একথা চিন্তা করতে পারে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেই সময়টি (কিয়ামত) কখন আসবে?[২২] সেই সময়টি বলার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? এর জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ। তাঁর ভয়ে ভীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করাই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব।[২৩] যেদিন এরা তা দেখে নেবে সেদিন এরা অনুভব করবে যেন (এরা দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) একদিন বিকালে বা সকালে অবস্থান করেছে মাত্র।[২৪]

এই সমস্ত জিনিস দেখার পরও যে ব্যক্তি বলে আখেরাত অনুষ্ঠিত হবে না সে যেন বলতে চায়, এখানে অন্য সবকিছুই হিকমত তথা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে হচ্ছে, তবে শুধুমাত্র পৃথিবীতে মানুষকে যে বুদ্ধি, সচেতনতা ও ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতা নেই। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষকে বিপুল ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সব রকমের ভালো মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে কিন্তু কখনো তার কাজের কোন হিসেব নেয়া হবে না,—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্যহীনতা ও অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

১৯. এই মহাবিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ জন্য এখানে الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى (আত্‌তাম্মাতুল কুবরা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ্‌" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ বুঝায় যা সবকিছুর ওপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ ও বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য শুধুমাত্র "তাম্মাহ্‌" শব্দ যথেষ্ট নয়।

২০. অর্থাৎ যেদিন মানুষ দেখে নেবে যে, দুনিয়ায় যে হিসেব-নিকেশের খবর তাকে দেয়া হয়েছিল সেদিনটি এসে গেছে। সে সময় আমলনামা হাতে দেবার আগে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল এক এক করে সবকিছু তার মনে পড়ে যাবে। কোন কোন লোক দুনিয়াতেও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে যে হঠাৎ তারা কোন ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়। মৃত্যুকে তাদের একেবারে অতি নিকটে দেখতে পায়। এ অবস্থায় নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের চিত্র তাদের মানস পটে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে ওঠে।

২১. আখেরাতে আসল ফায়সালার ভিত্তি কি, সে কথা এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, মানুষ দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং স্থির করে নিয়েছে যে, যেভাবেই হোক না কেন দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তার লক্ষ।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগীটি হচ্ছে দুনিয়াবী জীবন যাপন করার সময় মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে যে, একদিন তাকে নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং প্রবৃত্তির অভিলাশ পূরণ করতে সে এ জন্য বিরত থাকবে যে, যদি এখানে সে নিজের প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিয়ে কোন অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে অথবা কোন অবৈধ ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের রবের কাছে এর কি জবাব দেবে? মানুষ দুনিয়ার জীবনে দু'টি দৃষ্টিভংগীর মধ্য থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করবে এরি ওপর আখেরাতের ফায়সালা নির্ভর করবে। যদি প্রথমটি গ্রহণ করে তাহলে তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যদি দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে, তাহলে তার স্থায়ী ও চিরন্তন আবাস হবে জান্নাত।

২২. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্ন করতো। তাদের এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল কিয়ামত কবে হবে, তার সময় ও তারিখ জানা নয় বরং এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুল্‌ক ৩৫ টীকা দেখুন)

২৩. এর ব্যাখ্যাও সূরা মুল্‌কের ৩৬ টীকায় আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে তার ভয়ে ভীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়াই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব—একথা বলার অর্থ এ নয় যে, যারা ভীত নয় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সতর্ক করে দেবার ফায়দা তারাই লাভ করতে পারবে যারা সেদিনটির আসার ভয়ে ভীত থাকবে।

২৪. এ বিষয়বস্তুটি এর আগেও কুরআনের আরো কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আমি সেখানে করে এসেছি। এ জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৫৩ টীকা, বনী ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা-হা ৮০ টীকা, আল মু'মিনূন ১০১ টীকা, আর রূম ৮১-৮২ টীকা ও ইয়াসীন ৪৮ টীকা দেখুন। এ ছাড়াও সূরা আহকাফের ৩৫ আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করিনি। কারণ এর আগেও কয়েক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।